সিঙ্গাপুরের বাঙ্গালীঃ 'এলিট', 'সেমি-এলিট' আর 'ওয়ার্কার' দের কথা!

অভিজিৎ রায়

- 'লন ভাই, বাংলা পেপার লইয়া যান, আইজক্যার পেপার'।
- আইজক্যার নি?
- হ আইজক্যার, একটু আগে দিয়া গেল।
- কত দাম?
- দেড় টেকা[১] দেন।
- ধুর মিয়া, এক টেকায় কিনি সব সময় ...

লিটল ইন্ডিয়া জায়গাটা সিঙ্গাপুরের 'বাংলা'[২] দের কাছে অনেকটা যেন সৌদি আরবের মক্কা। যে যেখানেই থাকুক না কেন সারা সপ্তাহের কাজ কর্ম শেষে রোববার দিন সেরাঙ্গুনের রাস্তায় জড় হওয়া তাদের চাই ই চই। রোববার দিনটা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে যেন 'বাঙ্গালীদের মিলন মেলা'। ওই দিন কাউকে যদি বাংলাদেশ থেকে তুলে এনে লিটল ইন্ডিয়ার ওই রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তিনি হয়ত ভুল করে ধরেই নেবেন যে তিনি ঢাকা শহরের গুলিস্তান এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। প্রায় পচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বাংলাভাষাভাষী লোক - কেউ হাটছে, কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে, কেউ খিস্তি-খেউর করছে, আর কেউবা আস্তিন গুটিয়ে ডাল দিয়ে ভাত মাখিয়ে খেতে বসেছে - 'মুহম্মদিয়া রেস্টুরেন্টে'। দোকানের নামগুলিও সব বাংলায়, মানে বাংলা হরফে লেখা - মুহাম্মদিয়া, রাধুনী, তন্ময়, -এ এক অভাবনীয় ব্যাপার; সিঙ্গাপুরের আর কোথাওই বোধ হয় এ ব্যাপারটা দেখা যাবে না। ওই দিন যারা লিটল ইন্ডিয়ায় ভীড় করেন তাদের মধ্যে প্রায় সবাই হচ্ছে যাদের আমরা বলি - 'ওয়ার্কার'; 'এলিট' সমাজের বাঙ্গালীরা অবশ্য পারত পক্ষে 'গ্যাঞ্জাম' দেখে রোববারের দিনটিতে সেরাঙ্গুনে পা রাখেন না।

তবে এই এলিটরা সিঙ্গাপুরে সংখ্যায় খুবই অল্প। হাতে গোনা চারশটি পরিবার হবে হয়ত[৩]। এদের কেউবা এন.ইউ.এস বা এন.টি. ইউ এর মত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক হিসেবে আছেন, কেউ জাহাজের ক্যাপটেন, বা ম্যারিন ইঞ্জিনিয়র, অথবা শুধুই ইঞ্জিনিয়র, অনেকে আবার আর্কিটেকট কিংবা কেউ হয়ত পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। এদের অনেকেই সিঙ্গাপুরের নাগরিক কিংবা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট' বা সংক্ষেপে

---

[১] *এই 'টেকা' বাংলাদেশী টাকা নয়, সিঙ্গাপুরী ডলার। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত শ্রমিকেরা ডলারকে 'টেকা' বা 'টাকা' বলে থাকে।*

[২] *সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাঙালী শ্রমিকেরা একে অপরকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করে থাকেন।*

[৩] *New Trends and Changing Landscape of Bangladeshi Migration, Habibul Haque Khondker, Report on International Labour Migration from South Asia, pp 57-88*

পি.আর। অনেকে আবার সিঙ্গাপুরকে অস্ট্রেলিয়া বা উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী নিবাস গড়ার মধ্যবর্তী একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবেরাই যারা আজ ক্যানাডা বা আমেরিকায় বসবাস করছেন সিঙ্গাপুরকে এধরনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন একটা সময়।

এই স্বল্প সংখ্যক 'এলিট'দের কথা বাদ দিলে সিঙ্গাপুরের বাংলা ভাষাভাষীদের পুরো অংশটিই কিন্তু সেই খেটে খাওয়া মানুষ, যাদেরকে আমি উপরে 'ওয়ার্কার' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। সিংঙ্গাপুরে এই ওয়ার্কারদের সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারের মত[৪]। এদের দেশান্তরী হবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটি বলবার আগে সিঙ্গাপুর দেশটি সম্বন্ধে একটুখানি জেনে নেওয়া দরকার। সিঙ্গাপুর শুধু এশিয়াতেই নয়, এ পৃথিবীতেই অত্যন্ত দ্রুতগামী অর্থনৈতিকভাবে ক্রমবর্ধিষ্ণু একটি দেশ হিসেবে পরিচিত। সিঙ্গাপুর মালয়শিয়া থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে স্বাধীন হয় ১৯৬৫ সালে, তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছর পাঁচেক আগে। স্বাধীন হবার পর থেকেই সরকার ও জনগণের নিরন্তর প্রচেষ্টায় এটি অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী একটি দেশে পরিনত হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পেছাতে পেছাতে আজ তলানীতে এসে ঠেকেছে সেখানে প্রায় একই রকম অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৮.৫ ভাগ হারে, যা খোদ আমেরিকার বার্ষিক সমৃদ্ধির তুলনায় তিনগুন বেশী[৫]। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে জনবল তো আর বাড়েনি, ফলে একটা সময় দেখা দিয়েছে শ্রমিক স্বল্পতা। শ্রমিক স্বল্পতা সমাধানের একটা সহজ উপায় হচ্ছে হত-দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে সুলভ-মূল্যে শ্রমিক আমদানী। সিঙ্গাপুরও তাই করল; সমস্যা সমাধানের তড়িৎ ব্যবস্থা হিসেবে জলের দামে কিনে আনলো কায়িক শ্রম - 'অন্ধের যষ্ঠি' ওই তৃতীয় বিশ্ব থেকেই। এরই ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে এ দেশে তৈরী হল বিশাল এক বৈদেশিক জনশক্তি। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে এই বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক, যা মোট জনশক্তির ৩০ ভাগ; যে কোন বিচারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু সর্বোচ্চ।

যদিও বিদেশী শ্রমিকদের জন্য সিঙ্গাপুরের দরজা খুলে গিয়েছিল ষাটের দশকের গোড়াতেই, বাংলাদেশ থেকে গণহারে এখানে শ্রমিক আসা শুরু হয় মূলতঃ নব্বই এর দশকে - সেই উপসাগরীয় যুদ্ধ বা 'গালফ ওয়ারের' পর থেকে। যে কোন দেশের প্রেক্ষাপটেই শ্রমিকদের দেশান্তরী হবার পেছনে কিছু কারণ থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই সারা বিশ্বের শ্রমিকদের মাইগ্রেশন বা দেশান্তরী হওয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এবং এখনো

---

[৪] *সংখ্যাটি নিয়ে মতভেদ আছে। Bangladeshi Workers in Singapore: A sociological Study of Temporary Labour Migration, PhD Thesis, Md. Mizanur Rahman দ্রষ্টব্য*

[৫] *Migration as Status-Enhancement: A Study of Bangladeshi Workers in Singapore, Md. Mizanur Rahman, National University of Singapore*

করছেন। যেমন, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক রোনাল্ড স্কেলডনের কথা বলা যায়। দারিদ্রতা আর শ্রমিকদের দেশান্তরের বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। স্কেলডন মনে করেন শ্রমিকদের 'নিজভূম ছেড়ে পরবাসী' হওয়ার পেছনে অন্যতম যে কারণটি কাজ করছে তা হল হল দারিদ্র্য[৬]। এটা তো স্বাভাবিকই। তবে এই 'দারিদ্র্যের কারণে দেশত্যাগের' বাইরেও আরেকটি বিষয় আছে, যা অনেক সময়ই বিশেষজ্ঞেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে; আর তা হল - দেশান্তরী হবার কারণে বা ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য। হ্যা, দারিদ্র্যের কারণেই মানুষ শুধু দেশান্তরী হয় নি, বরং দেশান্তরী হয়েও আবার অনেকে দরিদ্র হয়েছে। Straits Times এ ১৯৯৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর তারিখে 'Journey of Hope' নামে একটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক শারন ভাসুর মতে, প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ বাংলাদেশী জমি-জমা, গরু-বাছুর বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা ধার-কর্জ করে সিঙ্গাপুর পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে সোনার হরিণের খোঁজে। যেমন দাউল মিয়ার কথাই ধরা যাক। প্রায় দেড় লক্ষটাকা ঋণ (দেশীয় ভাষায় ওরা বলে 'চালান') করে দাউল মিয়া সিঙ্গাপুর এসেছিল 'কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার' হিসেবে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে বেচারা চাকরি হারায়। ভেবেছিল চাকরি করতে করতে দেশে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠিয়ে চালানের টাকা শোধ করবে। তা তো হলই না, বরং জমি-জমা সব হারিয়ে, একরকম নিঃস্ব হয়েই আজ তাকে দেশে ফিরতে হচ্ছে। আর মড়ার উপর খারার ঘা হিসেবে মাথার উপর তো বিশাল ঋণের বোঝা আছেই। দাউল মিয়ার দু চোখ অন্ধকার। আপনি যদি লিটল ইন্ডিয়ায় রোববার সন্ধ্যায় 'মধ্যবিত্ত সুলভ' উন্নাসিকতা বাদ দিয়ে সাধারণদের ভীড়ে মিশে যেতে পারেন আর দু-দন্ড বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে পারেন, দেখবেন, আপনার চারপাশে এমন অনেক দাউল মিয়া। কারও চাকরী গেছে, কারো বা চুক্তি নতুন করে নবায়ন করা হয়নি, কাউকে আবার বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, চাকরী করতে এসে একবছরের মধ্যে যাদের চাকরী যায় কিংবা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তাদের পক্ষে আসলে চালানের পুরো টাকা কখনই শোধ করা সম্ভব হয় না। আমি যখন ১৯৯৮ সালের শেষভাগে সিঙ্গাপুর এসেছিলাম তখন দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশ গুলোতে চলছিল ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা। ওই অঞ্চলে মন্দার প্রথম সূত্রপাত কিন্তু ঘটেছিল ১৯৯৭ এর মাঝামাঝি সময়ে-থাইল্যান্ডে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই থাইল্যান্ডের সীমানা পার হয়ে অতি দ্রুত আন্যান্য আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমি নিজ চোখে দেখেছি কিভাবে বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরী শ্রমিকরা মন্দার শিকার হয়েছিল - অনেকেরই ওয়ার্ক পার্মিট বাতিল হয়েছিল, আর তারপর দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।

তবে সে হিসেবে কিন্তু 'বাঙ্গালী এলিট'রা তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল আছে। ভাল থাকারই কথা। কারণ আগেই বলেছি এই এলিটদের প্রায় প্রত্যেকেই সিঙ্গাপুরের নাগরিক কিংবা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত পি.আর। ফলে চাকরী চলে গেলেও সিঙ্গাপুর থেকে

---

[৬] *Migration and poverty, Ronald Skeldon, Asia-Pacific Population Journal, vol. 17(4): 67-82, 2002.*

তাড়া খেয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার ভয় নেই। এটা একটা বড় নিশ্চয়তা। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা থাকলে যা হয়, বাড়তি কিছু করার ইচ্ছা জাগে মনে। আর সে জন্য এরাই কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে দেশের বাইরে গিয়েও 'বাঙ্গালীত্বের চর্চা' করে চলেছে। আবার অনেকে বলেন, দেশের বাইরে গেলেই নাকি দেশের প্রতি 'টান'টা বৃদ্ধি পায়। কারণ যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা মন্দ নয় অবশ্য। বরং উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের নিরিখে বিচার করলে তাঁদের অবদানকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেই হবে। সিঙ্গাপুরের বহুল আলোচিত 'বাংলা স্কুল'টির কথাই ধরা যাক। ১৯৮০ সালের দিকে 'বাংলা ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারারি সোসাইটি'র উৎসাহী সদস্যরা সিঙ্গাপুরে বসবাসরত প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানদের বাংলাভাষা, সর্বোপরি দেশজ কৃষ্টি আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলেছিল স্কুলটি[৭]। প্রথম দিকে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী (৫৬ জন) নিয়ে শুরু হলেও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় মুলতঃ ১৯৯৪ সালে যখন সিঙ্গাপুর সরকার বাংলাভাষাকে অন্যতম দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেয়। ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা শেখার উদ্যোগ তো আছেই, সেই সাথে প্রতিবছর থাকে 'বাংলা ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারারি সোসাইটি'র উদ্যোগে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন; কখনও একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে, কখনও বা ২৬ এ মার্চ উপলক্ষে আবার কখনও বা পয়লা বৈশাখে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব লোভনীয়। বাংলাস্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে - 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো...' তখন মনেই হয় না আমি বাংলাদেশের বাইরে কোথাও আছি। অনেক সময়ই আবার বাইরে থেকে বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে আসা হয় - এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে। সিঙ্গাপুরে বসে থেকেই আমি শুনেছি হৈমন্তী শুক্লা, সুবীর নন্দী, মমতাজ প্রমুখ শিল্পীর গান, দেখেছি শীবলি-শামীম আরা নিপার নাচ, অথবা কোন বিখ্যাত শিল্পীর জাদু। এ তো কম পাওয়া নয়! আবার প্রায়শঃই এ ধরণের অনুষ্ঠাণ যখন করা হয়, উপরি হিসেবে থাকে বাংলাদেশী খাবার দাবারের ঢালাও ব্যবস্থা। পিঠা-পুলি, পাটিশাপটা থেকে শুরু করে হালিম, চটপটি, সিঙ্গারা-সমোচা এমনকি চিকেন বিরিয়ানী -কি নেই সেখানে! বিদেশ বিভুইয়ের যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত স্বপ্ন বিলাসীরা বছরে অন্তত একটি দিনের জন্য হলেও 'স্বদেশী আমেজ' উপভোগ করেন।

তবে এই 'এলিট সোসাইটি'কে বাংলা সংস্কৃতির 'ধারক ও বাহক' হওয়ার সকল কৃতিত্ব দিয়ে দিলে ব্যাপারটা একপেশেই হয়ে যাবে বৈকি। আসলে 'সংস্কৃতি' বলতে কিছু মধ্যবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের গায়ে পাঞ্জাবী লাগিয়ে একুশের অনুষ্ঠান করা কিংবা পয়লা বৈশাখে শখ করে 'পান্তা খাওয়া' আর ঢুলু ঢুলু চোখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাইই তো কেবল নয়, যদিও

---

[৭] *যদিও তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে* 'BLLS - Bangla Language and Literary Society, Singapore' *এর ওয়েব সাইট থেকে, কিন্তু যারা সিঙ্গাপুরে দীর্ঘদিন ধরে আছেন তারা জানেন, আসলে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনেক পরে। মূল সংগঠনটির নাম 'বাংলাদেশ সোসাইটি'। ১৯৯৪ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে তিক্ততা শুরু হলে কিছু সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই সিঙ্গাপুরে বাঙ্গালীদের জন্য এখন দুটি সোসাইটি এবং দুটি বাংলা স্কুল।*

দীর্ঘদিনের লালিত ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতায় আমরা অনেক সময়ই অমনটিই ভেবে নেই। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের বাদ দিয়ে আসলে কোন সংস্কৃতি হয় না, কখনই হয়নি- লেখা-পড়া জানা মধ্যবিত্তদের কাছে এ যতই বেমানান শোনাক না কেন। জারি-সারি-ভাটিয়ালী থেকে শুরু করে বাউল-সহজিয়া, পুথি-পাঠ, যাত্রা, কবি-গান, সব কিছুই তো গড়ে উঠেছে স্বতস্ফুর্ত ভাবে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে - এ প্রমাণ তো আমাদের সংস্কৃতিতে ভুরি ভুরি। সেরাঙ্গুনের রাস্তায় গেলেই বোঝা যায়, ওই হত-দরিদ্র মানুষ গুলো কিভাবে তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের নিজেদের মত করে। এখানে মমতাজ, কাঙ্গালিনী সুফিয়া, ইন্দ্রমোহন রাজবংশীদের গান কি ভীষণ জনপ্রিয়! দেলওয়ার হোসেন সাইদীর ওয়াজ-মাহফিলের ক্যাসেট কিংবা হিন্দী ছবির আগ্রাসন বহমান ধারাকে কিছুটা দিকভ্রষ্ট করলেও বাঙালী আবহমান ঐতিহ্যের মূল সুরটিকে ম্লান করতে পারেনি এতটুকুও।

এবার আরেকটি ছোটট গোষ্ঠির কথা না বললে সিঙ্গাপরের বাঙ্গালীদের গল্পটি অসমাপ্তই থেকে যাবে। এরা হল সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা। এদেরকে বরং 'সেমি-এলিট' নামে অভিহিত করা যাক। এরা 'সেমি এলিট' কারণ, এদের অবস্থা একেবারে 'ওয়ার্কার'দের মত 'দিন আনি দিন খাই' নয়, আবার ছাত্র থাকাকালীন এরা 'এলিট' শ্রেনীর পর্যায়ভুক্ত হওয়ারও দাবী করতে পারে না, যদিও এদের চলাফেরা, উঠাবসা, দহরম মহরম থাকে মূলতঃ ওই এলিট শ্রেণীর সাথেই। এরা সেমি-এলিট থেকে এলিট শ্রেণীতে উন্নিত হয় মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে চাকরী পাবার পর। চাকরী পাওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই তাদের আবস্থা যেন রাতারাতি বদলে যায়। তখন আর বাজারে গিয়ে দুটো বেগুন কিনতে গেলেই পয়ত্রিশ দিয়ে গুন করে বাংলাদেশী টাকায় কত হল - এ হিসেবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না, কিংবা বাসা নেওয়ার সময় চার-পাঁচ জন সঙ্গী-সাথি নিয়ে বাসা খোঁজার আর থাকার দরকার পড়ে না। চাকরী পাবার সাথে সাথেই এরা প্রথমে 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট' বা পি.আর এর দরখাস্ত করে, বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসে, এতদিনকার সেমি-এলিট বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে, মানে আলাদা বাসা নিয়ে সংসার-ধর্ম পালন করা আরম্ভ করে, আরো কিছুদিন যাওয়ার পর এরা এখানে বাড়ী কিনে সিঙ্গাপুরকেই 'স্থায়ী নিবাস' হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রাথমিক ধাপগুলো সম্পন্ন করে ফেলে। এভাবেই তারা একটাসময় সেমি-এলিট শ্রেনী থেকে যাত্রা শুরু করে অলি গলি ঘুরে ধীরে ধীরে এলিট সমাজে ভীড়ে যায়। একুশ, স্বাধীনতা, কিংবা বৈশাখী অনুষ্ঠানে 'গান-বাজনা শুনতে' এদের সদ্য-বিবাহিত বৌয়েরা স্বামীর সাথে হাত ধরে হাজির হয়, আর একটু বেশী রাত হয়ে গেলেই উদ্বিগ্ন গলায় বলতে শুরু করে - 'ভাবী আজ যাই, ওর আবার কাল অফিস আছে!'

সিঙ্গাপুরে আধ্যয়নরত বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলছি যেহেতু, এই দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও কিছু কথা বলা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটা সময় সিঙ্গাপুর নামটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত এটি কেবল 'ব্যবসা বানিজ্যের জায়গা'। কেউ পড়াশোনা করতে সিঙ্গাপুরে আসছে - এটা মনে হয় কেউ ভাবতে পারত না। তবে বছর দশেক ধরে

সিঙ্গাপুরের এই ইমেজটা প্রায় পুরোপুরিই বদলেছে। সিঙ্গাপুরে আজ ন্যাশলাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এন.ইউ.এস), নানইয়ং টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি (এন.টি.ইউ), সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির (এস.এম.ইউ) মত আন্তর্জাতিক মানের ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধু নেই, সেই সাথে রয়েছে বিজ্ঞানের জটিল জটিল বিষয় নিয়ে গবেষনার জন্য গালভরা নামের নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান। যেমন, বায়োইনফরমেটিক্স ইনস্টিটিউট, জিনোম ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, ইনস্টিটিউট অব মলিকিউলার সেল এন্ড বায়োলজি, কেন্ট রিজ ডিজিটাল ল্যাব, ইনফরমেশন টেকনলজি ইনস্টিটিউট, ইমরি, গিনটিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। এতকিছু একদিনে হুট করে তৈরী হয়নি, এর পেছনে রয়েছে সরকারের দেশ নিয়ে সুদূরপ্রসারী বাস্তবমুখী ভাবনা, রয়েছে ব্যবসা বানিজ্যকে গুরুত্ব দেবার পাশাপাশি বহুদিন ধরেই সিঙ্গাপুরকে শিক্ষা আর কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু (Education & Technology Hub) হিসেবে গড়ে তুলবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এ নিয়ে সেদিনও কথা হচ্ছিল ডঃ হাবিবুল হক খন্দকারের সাথে, তার অফিস কক্ষে বসে। উনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) সহকারী অধ্যাপক। সিঙ্গাপুরের সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর গবেষনা করেছেন, এখনও করছেন। তার মতে, ১৮১৯ সালের দিকেও সিঙ্গাপুরের পরিচিতি ছিল নিখাঁদ জেলে পল্লী বা 'ফিশিং ভিলেজ' হিসেবে, সেখান থেকে উঠে এসে সিঙ্গাপুর যে আজ আধুনিক, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং শিক্ষা আর কারীগরি বিদ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে - এর পেছনে কিন্তু সিঙ্গাপুর সরকারের একটা 'ভিসন' বা দূরদৃষ্টি সবসময়ই ছিল। সিঙ্গাপুরের 'জাতির পিতা' লিউ কান ইয়ু এর কথা আলাদা ভাবে বলতেই হয়। তিনি ছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকেন যে, তার মাথার 'অ্যান্টেনা'টি ছিল নাকি অনেক লম্বা! তাই পৃথিবীতে কোন কিছু ঘটবার সাথে সাথেই তার 'অ্যান্টেনা' দিয়ে সেটি ধরে ফেলতেন আর পরবর্তীতে সিঙ্গাপুরের সাথে সংযুক্ত করে ফেলতেন![৮] সে যাই হোক, আজকের এই 'আধুনিক' সিঙ্গাপুর গঠনের পেছনে লিউ কানের অবদান কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অনস্বীকার্য। আরো দেখা গিয়েছে যে, সেই শুরু থকেই গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজে সিঙ্গাপুর সরকার পয়সা খরচ করতে কখনই কোন কার্পণ্য করেনি। এছাড়াও সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড, এম আই টি, জর্জিয়া টেক, জন হপকিনস প্রভৃতি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সাথে ইদানিং নানা ধরনের 'জয়েন্ট কোলাবরেশন' শুরু করেছে। তার ফলশ্রুতিতে সিঙ্গাপুরের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বছরের একটা সময় এমনকি সিলিক্যন ভেলীর মত জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারছে। সরকার মনে করে এদের একটা বড় অংশই দেশে ফিরে এসে সিলিকন ভ্যালির মত মেধা, উদ্যম আর সৃজনশীলতার সংস্কৃতি সিঙ্গাপুরেও চালু করবে[৯]।

---

[৮] *Straits Times, October 8, 1999*

[৯] *Fishing Village to Technopolis and Biopolis: Science and Technology Parks in Singapore, Habibul Haque Khondker, Information Technology Parks of the Asia Pacific: Lessons for the Regional Digital Divide. Armonk, New York: M.E. Sharpe. 2003. pp. 151-192*

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ব্যবস্থা রেখেছে মেধাবী ছাত্রদের জন্য আকর্ষনীয় বৃত্তির। এ যেন সুলভ মূল্যে শ্রমিক সংগ্রহের মতই সংগ্রহ করা সুলভ মূল্যে 'তৃতীয় বিশ্বের মেধা'! আসলে সত্যই কথা বলতে কি - সিঙ্গাপুরের শ্রম, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা - সবকিছুর বুনিয়াদ কিন্তু ওই 'বৈদেশিক- মেধানির্ভর'। সিঙ্গাপুর সরকারও সেটি ভালভাবেই জানে! আপনি যদি বোঝাতে পারেন যে আপনার মেধা আছে, আর সিঙ্গাপুরেরে উন্নয়নের জন্য আপনার মেধা খুবই প্রয়োজনীয় - তাহলেই দেখবেন, আপনার জন্য সুযোগ-সুবিধার কোন কমতি নেই! সিঙ্গাপুর সরকার আপনাকে ধরে রাখবার জন্য সবকিছুই করবে! ভাল বৃত্তি আর সুযোগ সুবিধার কারণে প্রতি বছরই অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়তে আসে; বিশেষ করে সেপটেম্বর ১১ এর ঘটনা যেন সিঙ্গাপুরের জন্য 'শাপে বর' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় আমেরিকা ভিসা নিয়ে মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর উপর নানা ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করায় বাংলাদেশী অনেক মেধাবী তরুন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সিঙ্গাপুর একটি 'বিকল্প সমাধান' হিসেবে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছিল। সেই ধারাটি এখনও বজায় রয়েছে বেশ ভালভাবেই। বিশেষ করে আপনি যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা সাম্প্রতিক ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরিসংখ্যান নেন, তা হলে দেখবেন তাদের বেশীরভাগই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে প্রথম সারির ছাত্র-ছাত্রী।

সিঙ্গাপুরে এ সমস্ত বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের 'বাঙালীত্বের চর্চা'টি কি রকম? খুব একটা বেশী যে তা বলা যাবে না। কারণ তাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্ত্বরেই সময় কাটাতে হয় - একাডেমিক গবেষণার কাজ-কর্ম নিয়ে। বাড়তি কিছু করার সময় আসলেই কম। তারপরেও কাজকর্মের ফাঁকে বিকেলের একটা সময় হয়ত ক্যান্টিনে বসে আডডা দেয়, আর দিনের একটা সময় নিয়ম করে বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়ে। তাদের 'বাঙ্গালীত্বের চর্চা' আসলে ওই পর্যন্তই। কোন এক সপ্তাহান্তে হয়ত দলবেঁধে সেরাঙ্গুন বা অর্চার্ডের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, কিংবা কোন এক বাঙ্গালী ভাবীর বাসায় দাওয়াত খেতে চলে যায়। বাঙ্গালীত্ব নিয়ে যে আলাদা করে এদের চিন্তা আছে তা বলা যাবে না। তবে বাঙ্গালীত্ব নিয়ে চিন্তা না থাকলেও অন্য অনেক কিছু নিয়েই হয়ত আছে। যেমন, কোন দোকানে হালাল মাংস পাওয়া যায়, শুক্রবারদিন কোন মসজিদে নামাজ পড়তে হবে, কিংবা রোজার সময় কি দিয়ে ইফতারী করা হবে ইত্যাদি। অনেকে বলে, বিদেশে আসলেই নাকি বাঙ্গালীদের ধর্ম বোধ বৃদ্ধি পায়। এর কোন সামাজিক ব্যাখ্যা আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে ব্যাপারটি কিছুটা হলেও সত্যি। যে ছেলেগুলোকে একসময় দেখা যেত মেয়েদের হোস্টেলের সামনে জমিয়ে আডডা দিতে, কিংবা ঢাকা স্টেডিয়ামে হাবিবুল বাশারের ব্যাটিং দেখার জন্য ছুটতে, অথবা রিক্সায় চড়ে বেসুরো গলায় জেমসের গান গেয়ে বেড়াতে, তাদের অনেকেই বিদেশে পাড়ি দিয়ে দাড়ি রেখে টুপি পড়ে তবলিগ পার্টিতে ভীরে যায়, কিংবা রোজা, ঈদ, পুজা-পার্বন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়; ম্যাকডোনালডস এর চিকেন ফ্রাইয়ে কামর দিতে গিয়ে দু-বার চিন্তা করে - 'এটা সত্যই কি হালাল'! এর কারণ কি দেশে বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-

বান্ধবের কাছ থেকে দূরে থাকার ফলে নিঃসঙ্গতা বোধ, বৈদেশিক জীবনে অনভ্যস্ততা, অপরিচিত দেশের নতুন সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিকতা, অনিশ্চয়তা, নাকি উপায়ন্তর না দেখে ধর্মের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন?

আমি মাঝে মধ্যে কিন্তু ভাবি এই যে দেশ কালের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীবাসীর কাছে বাংলাভাষার এত্ত প্রচার আর প্রসারের আয়োজন এর পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? এটাও কি প্রচ্ছন্ন অর্থে এক ধরণের সাম্প্রদায়িকতা নয়? নাকি 'বিদেশী'দের কাছে নতুন করে আত্মপরিচয়ের সন্ধান লাভের মেকি চেষ্টা? নাকি স্রেফ এক ধরনের 'জাতিগত অহংবোধ'? হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো সত্যি। আনেক সময়ই আমি দেখেছি, বাঙ্গালী ছাত্ররা কেবল বাঙ্গালী ছাত্রদের সাথেই মিশছে, তাদের সাথেই উঠাবসা করছে। দেখলে মনে হবে আন্তর্জাতিকতার হাওয়া তাদের গায়ে লাগেনি, লাগাতেও হয়ত তারা চায় না। যে কোন বিচারে এটা তো অবশ্যই একধরনের কুপমুন্ডুকতা। তবে যারা এই গন্ডিবদ্ধ ধারণা নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেন, তারা ভুলে যান বাঙালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য কিন্তু কুপমুন্ডুকতার নয়, বরং ঔদার্যের, নির্মলতার আর মুক্ত-বুদ্ধির। আর এটাতো ঠিক যে, প্রত্যেক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরই পৃথিবীকে কিছু না কিছু দেওয়ার থাকে; আর এভাবেই 'বিশ্ব-মানবতা' এগিয়ে যায়। প্রয়োজনের তাগিদে বাঙ্গালীরা আজ তার আদি নিবাস পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে - পৃথিবীর একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে আবহমান বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আর বাংলার মাটির সেঁদো গন্ধ। এই অনাবিল সংস্কৃতির সংস্পর্শে পৃথিবীবাসীর যেমন পাওয়ার আছে অনেক কিছু, তেমনি বাঙ্গালীদেরও আসলে তাদের থেকে নেওয়ার আছে অনেক। এ শুধু দেনা-পাওনার নিরস হিসেব নয়, বরং প্রয়োজনটা সহযোগিতার, সহমর্মিতার এবং সেই সাথে পরিবর্তিত বিশ্বে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার। আগামী বিশ্বে বাঙ্গালী জাতির শুধু টিকে থাকা নয়, তার দৃপ্ত পদচারণার সম্ভাবনাটুকু নির্ভর করবে এই বাস্তবমুখী উপলব্ধির উপরই।

৮ মে, ২০০৫

অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলবিদ, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের গবেষক, মুক্ত-মনা (*www.mukto-mona.com*)র ফাউনডিং মডারেটর, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' গ্রন্থের লেখক। । ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com